



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 971 - 982

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : সাহিত্য সমালোচনার পুনর্মূল্যায়ন

ড. মুন্সী মহম্মদ সাইফুল আহমেদ

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, অসম

Email ID: saifulphd@gmail.com

 0000-0002-6317-4484

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Manik
Bandopadhyay,
Literary
complain,
Dhurjotiprasad
Mukhopadhyay,
constructive
criticism,
socialist realism,
Freudian
psychoanalysis,
Marxist criticism.

Abstract

In 1940, Dhurjatiprasad Mukhopadhyay authored the inaugural critical essay on Manik Bandyopadhyay, titled 'Manik Bandyopadhyay', which was published in the 'Parichay' journal. By that time, Bandyopadhyay had already published twelve volumes of fiction. Notable among these were celebrated and popular novels such as 'Dibaratrir Kabya', 'Putul nacher Itikatha', and 'Padma Nadir Majhi, alongside short story collections including 'Atashimami O Anyanya Galpo', 'Pragoitihashik', 'Sarisrip', and 'Bou'.

While Bandyopadhyay's literary trajectory witnessed a distinct transition from the Freudian psychoanalytic approach of his early phase to the ideologies of Marxism and Socialist Realism following his induction into the Communist Party of India in 1944, it is particularly intriguing that the earliest appraisal of his work was conducted by a figure of Dhurjatiprasad Mukhopadhyay's stature—a rationalist writer and Marxist literary theorist. However, Mukhopadhyay raised certain objections regarding Bandyopadhyay's literature, establishing a legacy of criticism and inquiry that persisted in subsequent discourse.

In this research paper, we have critically examined the validity of these allegations against Bandyopadhyay, analyzing the extent to which they are logically grounded. Our findings suggest that the very elements previously identified as flaws have subsequently been recognized as Bandyopadhyay's distinctive strengths and stylistic signatures. Consequently, this study illuminates the historical significance of Dhurjatiprasad Mukhopadhyay's essay from multiple perspectives.

Discussion

ভূমিকা : আমাদের হয়তো অনেকেরই অজানা যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-কৃতির প্রথম মূল্যায়ন করেছিলেন সমকালীন কথাসাহিত্যিক ও মননশীল আলোচক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে 'পরিচয়' পত্রিকায় তিনি 'মানিক

বন্দ্যোপাধ্যায়' নামে ঐতিহাসিক প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। প্রবন্ধটিতে উত্থাপিত হয়েছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেশ কিছু সাহিত্যিক ক্রটি ও অভিযোগ। সে-সময় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখালেখির বয়স এক দশক পার হয়েছে মাত্র। তবে, প্রকাশিত হয়ে গেছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গল্প ও উপন্যাস। বর্তমান নিবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে পৌঁছানোর পূর্বে আমরা দেখে নেব, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাসের পরিচয়। কারণ, তার উপর ভিত্তি করেই মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী লেখক ধূর্জটিপ্রসাদের মূল্যায়নের যৌক্তিকতা ও প্রাসঙ্গিকতা বিচার সম্ভব হবে।

‘বিচিত্রা’য় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম যে গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল— তার নাম ‘অতসী মামী’ (১৯২৮)। তাঁর ৪৮ বছরের সাহিত্য জীবনে ১৯৪০-এর মধ্যে ‘বিচিত্রা’, ‘বঙ্গশ্রী’, ‘ভারতবর্ষ’ প্রভৃতি পত্রিকায় লিখেছেন অগুনতি; গল্প-উপন্যাস মিলিয়ে প্রকাশিতও হয়েছে ১২টি গ্রন্থ। এই সময়ের মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন সাতটি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস ও পাঁচটি গল্পগ্রন্থ। সেগুলি হল— ‘জননী’ (১৯৩৫), ‘দিবারাত্রির কাব্য’ (১৯৩৫), ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ (১৯৩৬), ‘পদ্মানদীর মাঝি’ (১৯৩৬), ‘জীবনের জটিলতা’ (১৯৩৬), ‘অমৃতস্য পুত্রঃ’ (১৯৩৮), ‘শহরতলী’ ১ম পর্ব (১৯৪০); আর গল্পগ্রন্থগুলি হল— ‘অতসীমামী ও অন্যান্য গল্প’ (১৯৩৫), ‘প্রাগৈতিহাসিক’ (১৯৩৭), ‘মিহি ও মোটা কাহিনী’ (১৯৩৮), ‘সরীসৃপ’ (১৯৩৯), ‘বৌ’ (১৯৪০) প্রভৃতি। অর্থাৎ আমরা দেখছি, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত গল্প-উপন্যাসের সংখ্যা নিতান্ত স্বল্প নয়। বরং কথাসাহিত্যে মার্কসবাদ ও সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার রূপকার মানিকের সবথেকে জনপ্রিয় রচনাগুলির অধিকাংশ এই সময়পর্বেই প্রকাশিত হয়ে গেছে। তাই, প্রথম সমালোচক হিসেবে ধূর্জটিপ্রসাদের মূল্যায়নের ইতিবাচকতার প্রতি আমরা প্রত্যয়ী ও প্রত্যাশী ছিলাম। ‘মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়’ নামক স্বল্পদৈর্ঘ্যের রচনার অন্তিমে তিনি একটা মারাত্মক কথা বলেন, যা আমাদের নজরে আটকে যায়। ধূর্জটিপ্রসাদ যে মোক্ষম অভিযোগটি এনেছেন তা হল—

“তাঁর (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়) রচনায় ধৃতি নেই। যদি আসে তবে বাংলা সাহিত্যের সৌভাগ্য বলতে হবে।”^১

‘ধৃতি’ শব্দের অর্থ ‘দৃঢ়তা’। সমালোচক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়^২ যখন মানিকের সাহিত্যের প্রথম মূল্যায়ন করতে এসে সাহিত্যের ‘দৃঢ়তা’র প্রশ্ন তুলে দেন; আর কেবল তা-ই নয়, ‘অশিক্ষিতপটুতা’ ও ‘য়োটোপিয়া প্রীতি’-র মতো মারাত্মক অভিযোগ গুলিকে ৭টি উপন্যাস ও ৫টি গল্পগ্রন্থ পাঠের অভিজ্ঞতার পরও উত্থাপন করেন ও জিইয়ে রাখেন, তখন প্রশঙ্গটি বিস্তারিত বোধ ও বীক্ষণ দাবী রাখে। এ প্রশঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদের বক্তব্যের কিছুটা উদ্ধৃতি অনুসরণ করতেই হয় অভিযোগটির ব্যাপ্তি ও গভীরতা বোঝার জন্য—

“মানিকলালের প্রায় সব রচনাই পড়েছি। পড়ে আমার সন্দেহ হয়েছে যে তাঁর প্রতিভা কৃতিত্ব অশিক্ষিতপটুতা। অন্য ভাষায়, তাঁর প্রতিভা স্বভাবসিদ্ধ। তাঁর অসমতা ধারণার অক্ষমতা থেকে উৎপন্ন। তিনি প্রকৃত জিনিসটা ধরেছেন, কিন্তু মুঠো তাঁর আলগা হয়ে যায় এই জন্য যে শক্ত মুঠির শিক্ষা তাঁর নেই। এ-যুগের উপযোগী রচনার জন্য অভিজ্ঞতার মূলধন কিংবা ঐশী শক্তিটাই যথেষ্ট নয়। সজ্ঞানতার প্রয়োজন এ-যুগে ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। মানিকলালের চৈতন্য মার্জিত নয়—নচেৎ ‘পদ্মানদীর মাঝি’, ‘কুষ্ঠরোগীর বৌ’-এর মতন লেখায় তাঁর যুটোপীয়া-প্রীতি সংঘত হত, বর্ণনার বৃকে মন্তব্যের ভোঁতা ছুরি বসত না, যেমন বসেছে ‘অহিংসা’য়।”^৩

স্বভাবতই এ কথা বোঝা যায়, যে মানিক সম্পর্কে প্রগতিবাদী^৪ ধূর্জটিপ্রসাদের অভিযোগগুলি নেতিবাচক কিন্তু গঠনমূলক, তবে তা কতটা যৌক্তিক তা বিচার করাই আমাদের কাজ। তাই, ‘ধৃতি’র প্রশঙ্গে ফিরে আসা যাক। মিশেল ফুকোর ‘সন্দর্ভ’ বা ‘ডিসকোর্স’^৫ ভাবনায় ‘উপাদানগত’ ও ‘কৌশলগত’ দৃষ্টিভঙ্গির কথা উঠে এসেছে। তাই, সাহিত্যে ‘দৃঢ়তা’র প্রশ্নে মানিকের রচনার উপাদানগত ও কৌশলগত সন্দর্ভ বা ডিসকোর্সটি বিচার আবশ্যিক হয়ে পড়ে, যা মানিকের সাহিত্য-সমালোচনার মানদণ্ড তৈরি করেছিল। ‘কলমপেচা মজুর’ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য বিচারে অপরাপর সমালোচকেরা কি বলেছেন, সে প্রশঙ্গ ধরে আমরা বিষয়টি ‘বোঝা ও বোধগম্য করা’^৬ — সমালোচনার এই রীতিতে অগ্রসর হব।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য বিচারে অগ্রসর হয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শিল্পরূপের বিশেষত্ব বিশ্লেষণ করেননি। বরং তিনি অধিক মনোনিবেশ করেছেন লেখকের অভিপ্রায় বা ডিকশন্ এবং কাহিনি ও চরিত্র-চিত্রণের প্রতি। প্রথম পর্বের রচনায় মানিকের ফ্রয়েডীয় চেতনার প্রয়োগ সমকালে যথেষ্ট বিতর্ক তুললেও পরবর্তী সমালোচকেরা নয়া বাস্তববাদী সাহিত্যতত্ত্বের বিশিষ্টতাগুলি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

অধ্যাপিকা সুতপা ভট্টাচার্য তাঁর ‘বিশ শতকের কথাসাহিত্য অপণ্ডিতের পাঠ’ গ্রন্থে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পর্বের উপন্যাসের নরনারীর সম্পর্কের সন্দর্ভ আলোচনায় বলেছেন—

“মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথমদিকের উপন্যাসে যে একা মানুষদের দেখেছি, তারা দলবাঁধা মানুষ নয় যেমন, তেমনি জোড়বাঁধা মানুষও নয়।”^৭

আমরা সহমত হতে পারি এই মন্তব্যের সঙ্গে কারণ, নর-নারীর সম্পর্কের প্রাতিষ্ঠানিকতাকে মেনে নিয়েও তার থেকে বিচ্যুতি-জাত সমস্যাই সচরাচর মানিকের উপন্যাসে চিত্রিত হয়ে থাকে, যেখানে যৌথ জীবনের মধ্যেই একাকী নায়কদের প্যাটার্ন দেখা যায় তাঁর আখ্যানে। সেক্ষেত্রে সম্পর্কের ‘দৃঢ়তা’র প্রসঙ্গটিও পাঠকের চেতনায় অভিনব বীক্ষার বোধ সৃষ্টি করে। আবার অপর সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর ‘বাংলা উপন্যাসের কালান্তর’ গ্রন্থে মানিকের শিল্পগুণ সম্পর্কে বলেছেন—

“মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় [১৯০৮-১৯৫৬] শিল্পকর্ম আলোচনাকালে প্রথমে লেখকের attitude towards life বা জীবন সম্বন্ধে লেখকের মনোভঙ্গির কথা অবশ্যই অপরিহার্য।...তিনি ফ্রয়েড এবং অতঃপর মার্কসকে অবলম্বন করেছিলেন। এর কোনটার জন্যই তাঁকে নিন্দিত বা নন্দিত না করে আমাদের দেখা দরকার যে, মানিকবাবু জীবন থেকে কি ‘নির্বাচন’ করেছেন, কোন বক্তব্যে পৌঁছতে চেয়েছেন— স্থূল কথায় তাঁর জীবনকে দেখার মনোভঙ্গিই কি!”^৮

ধূর্জটিপ্রসাদ থেকে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিন্তাসূত্রের ভঙ্গিটি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, মানিক-সাহিত্য সমালোচনার বিবর্তনরেখাটি। মার্কসবাদ বা ফ্রয়েডীয় ধ্যানধারণা— জীবনের ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের দ্বারা দ্রষ্টব্য জীবনকে উপস্থাপিত করলেও, মানিকের জীবন সম্পর্কে বিশেষ মনোভঙ্গি-ই তাঁর লেখনীর ক্রাফট নির্মাণের রেখাগুলি অতিক্রম করেছে। এ প্রসঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নিজ সাহিত্যপাঠের অভিজ্ঞতা থেকে বাংলা সাহিত্যের চরিত্রনির্মাণ প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুলেছেন—

“সাহিত্যে বাস্তবতা আসে না কেন, সাধারণ মানুষ ঠাই পায় না কেন? মানুষ হয় ভালো, নয় মন্দ হয়, ভালো-মন্দ মেশানো হয়না কেন? শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলিও হৃদয়সর্বস্ব কেন, হৃদয়াবেগ কেন সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে মধ্যবিত্তের হৃদয়।”^৯

বিজ্ঞাননিষ্ঠ প্রশ্নাতুর মন ও মনন নিয়েই তাঁর দেখা ও প্রত্যক্ষ করা সমাজ ও চরিত্রের আলো-অন্ধকারকেই মানিক দেখেছেন এবং ক্রমান্বয়ে দেখাতে চেয়েছেন তাঁর কথাবুননে—কথাশিল্পে। সমালোচক বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য তাই বলেন—

“সতর্ক পাঠক মাঝেই লক্ষ্য করবেন যে, ক্রমশ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের পটভূমি পরিবর্তিত হতে থাকে। চরিত্র সৃষ্টির প্যাটার্নটিও পালটে যায়।”^{১০}

আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধের শুরুতে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলেন যে, মানিকের রচনায় ‘ধৃতি’ অর্থাৎ ‘দৃঢ়তা’ নেই; আবার তিনি এও বলেছেন যে, ‘যদি আসে তবে বাংলা সাহিত্যের সৌভাগ্য বলতে হবে।’ কারণ হিসেবে তিনি যুক্তি দিয়েছেন—

“কারণ চাপের ওজন কতটা হতে পারে একমাত্র তাঁর রচনাতেই ধরা পড়ে। প্রমাণ? ‘কেরানীর বৌ’, ‘শহরতলী’, ‘পুতুলনাচের ইতিবৃত্ত’র একাধিক অংশ, ‘টিকটিকি’, ‘সিঁড়ি’।”^{১১}

অগ্রজ ধূর্জটিপ্রসাদের মানিক-সাহিত্য পাঠের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই কথাসাহিত্যে মানিকের টেকনিক বা প্রকরণের অভিনবত্বের প্রসঙ্গটি বোঝা ও বোধগম্য করার জ্ঞানতত্ত্বের এই ধারাতে বাধার সৃষ্টি করেছে। বিষয়টি আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হয়, যখন পড়ি—

“অনেক দিন ধ’রে তাঁর (মানিক) বিশেষত্ব কি বুঝতে ও বোঝাতে উৎসুক হয়েছি, কিন্তু পারিনি। কাজটা কোন কারণেই সোজা নয়, মানিকের বেলা আরো শক্ত, কারণ, প্রথমত তিনি এখনও অপরিণত, দ্বিতীয়ত, তাঁর আঙ্গিক আমাদের কাছে অপরিচিত।”^{১২}

এখন প্রশ্ন হল, মার্কসবাদী সাহিত্যতাত্ত্বিক হওয়া সত্ত্বেও ধূর্জটিপ্রসাদ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার প্রকরণ-নির্মাণের সূক্ষ্মতা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছেন? এ সংশয় তো বর্তমান নিবন্ধের প্রস্তাবনাতেই পাঠক অনুমান করতে পেরেছেন। নিতাই বসুর মতো সমালোচকেরা যখন বলেন, -

“মানিক বাংলা সাহিত্যে শুধু নয়, ভারতীয় সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী লেখক।”^{১৩}

তখন ধূর্জটিবাবুর প্রত্যয়ের প্রতি আমাদের সংশয় প্রবল হয়ে ওঠে; ‘আঙ্গিক অপরিচিত’ বলার মধ্যে কি কল্লোলের বাস্তববাদী ও সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদকে অস্বীকার করতে চান প্রাবন্ধিক? তাছাড়া, সাহিত্য সমালোচক হিসেবে ধূর্জটিপ্রসাদ নেহাত-ই লঘুদরের ব্যক্তি নন; ‘আমরা ও তাহারা’, ‘চিন্তায়সি’ ও ‘বক্তব্য’ নামক তিনটি উচ্চমান ও উচ্চমার্গের প্রবন্ধগ্রন্থসহ ৮০০ পৃষ্ঠার অধিক তাঁর রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড তাঁর সমালোচকের উচ্চাশন সুনিশ্চিত করেছে।

২

উপন্যাসসহ অন্যসব রচনা সরিয়ে রেখে বর্তমান নিবন্ধে ধূর্জটিপ্রসাদের বিজ্ঞাননির্ভর, বুদ্ধিদীপ্ত সমালোচনার ধারায় মানিকের সাহিত্য নিয়ে প্রথম সমালোচনাটিকে আশ্রয় করেছি আমরা। স্বভাবতই মানিক-সাহিত্য সমালোচনায় এটি ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখে তা বলাবাহুল্য, তবে এখানে যে ধূর্জটিপ্রসাদের স্বভাবজাত দম্ভ ও রাগের উৎসার ঘটেছে, তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে নজরে প’ড়ে, ‘কেন লিখি’ নামক প্রবন্ধে; সেখানে তিনি বলেছেন—

“লিখি দম্ভের জন্য, আত্মপ্রকাশের জন্য, রাগ প্রকাশের জন্য প্রধানত।”^{১৪}

তিরিশ-চল্লিশের বাংলা সাহিত্য যে পালাবদলের দিকে অগ্রসর হচ্ছে—রিয়ালিজম-মার্কসবাদ-মনোবিজ্ঞানের প্রভাবে সমাজের উপস্থাপনের রূপ-রীতির পরিবর্তন ঘটেছে তা ধূর্জটিপ্রসাদ অর্থনীতি-সমাজতত্ত্বের তাত্ত্বিক হিসেবে অনুধাবন করেছেন অবশ্য। তাই, ‘আমরা ও তাহারা’ গ্রন্থের অষ্টম স্তবক— ‘সাহিত্যের কথা : মানদণ্ড’ নামক রচনায় বলেন—

“একটা সমাজচেতনার সন্ধান চলছে। আমি পর্যাটিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। পূর্বতন সাহিত্যে সমাজবোধ ছিল না তা নয়, কিন্তু সেটা, ওই যা বলেছি, করুণা, দয়া, হৃদয়বৃত্তির পরিচালনা। বুদ্ধির দিক থেকে বিশেষ কিছু বিচার হয়নি। কাম-প্রবৃত্তির আলোচনায় ব্যক্তিত্বের বিকাশ তখনকার আধুনিক সাহিত্যে পাওয়া যায়। তবু সেটা সমাজচেতনা নয়, romantic revolt মাত্র। একটু বৈজ্ঞানিকভাবে কাজ শুরু হল প্রগতিশীল মার্কসবাদী সাহিত্যিকদের হাতে।”^{১৫}

এখানে আমরা দেখি ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সমাজচেতনার পরিবর্তনশীল দৃষ্টিভঙ্গির পিছনে যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং প্রগতি আন্দোলনের ফসল সাহিত্যে সরাসরি ফলতে শুরু করেছে তা সহজেই অনুধাবন করতে পেরেছেন। নাম না নিলেও এই ‘প্রগতিশীল মার্কসবাদী সাহিত্যিকদের’ মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে অন্যতম কথাকার এবং ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ইঙ্গিতে বিদ্ধ, তা আমরা সহজেই বুঝে নিতে পারি। কারণ মার্কসবাদী ও প্রগতিশীল গোষ্ঠীর তিনি ছিলেন অন্যতম সভ্য। কথাসাহিত্যিক ধূর্জটিপ্রসাদের সমালোচনা সাহিত্যে যে তাত্ত্বিক পরিসর ও পরিচয়, তা তাঁর প্রবন্ধগুলি পাঠ করলেই অনুধাবন করা যায়। এ প্রসঙ্গে সমালোচক অত্র ঘোষের রবীন্দ্র সমালোচনায় ধূর্জটিপ্রসাদের ভূমিকা কেমন, সেই আলোচনা— ‘রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তা : ধূর্জটিপ্রসাদের বিশ্লেষণ’ থেকে একটা উদ্ধৃতি নিয়ে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করব—

“সে-সময়কার গোঁড়া ও উগ্র মার্কসবাদীদের ঘরানার সমালোচনার অংশীদার নন ধূর্জটিপ্রসাদ সে-কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর দৃষ্টি ও মননশীলতা রীতিমতো চোখে পড়ার মতো এক ঘটনা। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণির মানুষের খণ্ডিত বোধ ও বুদ্ধি-বিভ্রমের নানা চিহ্নও তাঁর চোখে পড়ে— ‘আমরা ও তাহারা’ বইটির সর্বাপেক্ষে তা ছড়িয়ে আছে। ‘অন্তঃশীলা’ উপন্যাসের খগেনবাবু চরিত্রেও তা বিধৃত। এক

প্রবল আত্মসমালোচনার ভঙ্গিতেই এসব লেখা এবং এও ঠিক যে তাঁর আজীবন রবীন্দ্র-বিচার আদৌ গতানুগতিক ধারায় প্রবাহিত হয়নি।”^{১৬}

রবীন্দ্রসমালোচনায় ধূর্জটিপ্রসাদের ভাবনা বিশ্লেষণ করে প্রাবন্ধিক এখানে একদিকে ধূর্জটিপ্রসাদের সমালোচনার বীক্ষা ও তাত্ত্বিক অবয়ব কাঠামো এবং অপরদিকে প্রায়োগিক উপস্থাপনা সম্পর্কে আমাদের অবগত করেছেন। বাংলা সমালোচনার এই ধারাতেই আমরা দেখছি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য বিশ্লেষণে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন।

৩

ধূর্জটিপ্রসাদ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে যখনই কিছু বক্তব্য রেখেছেন, তখনই দেখি তিনি নির্মম ক্ষুরধার কলমে একেবারে আস্তিন গুটিয়ে সমালোচনায় নেমেছেন। এ প্রসঙ্গে মানিকের সাহিত্যের আর্ট ও জীবনদর্শন বিষয়ে ভয়ংকর প্রশ্ন উত্থাপন করে দেন আমাদের কাছে, তাঁর ‘আমরা ও তাহারা’ গ্রন্থে। অভিযোগ সেখানে আরও মারাত্মক, তবে শুরুতেই মানিকের প্রশংসা করেছেন। তিনি প্রশ্নোত্তরের ছলে বলেছেন—

“তাহারা: মানিক বাবু?

আমি: আমি বরাবরই মানিকের লেখার ভক্ত, এবং তাকে তার যুবাবয়স থেকে চিনি, তাই প্রাণ খুলে তার দোষগুণ দেখাতে পারি। আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রেমেন মিত্রের পর এমন ভালো গল্প কারুর হাত দিয়ে বেরোয়নি। দু’চারটি হিরের টুকরো। ওর গল্প পড়তে-পড়তে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দেয়। কিন্তু সেগুলো ছেড়ে দিলে কি থাকে? তার sense of construction নেই। সে স্টেজে ঢুকতে জানে, বেরুতে জানে না; আর পাদপ্রদীপের সামনে আড়ষ্ট হয়ে সে অস্পষ্ট আবৃত্তি করে, গা চুলকায়, কোথায় হাতদুটো রাখবে ভেবে পায়না। কিন্তু সে ভাবছে। এখনও তার ফল ফেলনি, তবে ভাবছে। বোধহয়, নিতান্ত ভয়ে-ভয়ে বলছি, ভগবানদত্ত ক্ষমতা তাঁর সবচেয়ে বেশি, কিন্তু তার সদ্ব্যবহার এখনও পর্যন্ত করেনি। চেষ্টা করছে জানি। এই জন্যে প্রগতিশীল সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত থাকা তার পক্ষে মঙ্গল। কিন্তু তাকে ছেড়ে দিতে হবে ওদের সঙ্গ কিছুদিন পরে। একটা মতের কাঠামোর মধ্যে চিরকাল থাকলে তার সর্বনাশ হবে। হ্যাঁ, বুঝতাম মতামত হজম করবার তার কন্মটা আছে, তবে সে বড় আর্টিস্ট হতেই হতো। কিন্তু ওটা তার ধর্ম মোটেই নয়। এমন লোক এমন অবস্থায়, নিজের চেষ্টায়, দেশের standard উঁচু রাখতে পারে না।”^{১৭}

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কত বড় আর্টিস্ট এবং তাঁর রচনার মাধ্যমে দেশের ও বাংলা সাহিত্যের standard কতটা উন্নত করেছেন, তা আজ আমাদের কাছে দিনের আলোর মতো সত্য ও সহজ হয়ে গেছে। এ বিষয়ে সমালোচক অলোক রায় ‘সাহিত্যিক ধূর্জটিপ্রসাদ’ নামক নিবন্ধে প্রাবন্ধিকের দৃষ্টিভঙ্গির স্বাভাবিকতার দিকে নজর দিয়েছেন—

“(ধূর্জটিপ্রসাদ) তারাক্ষর ও মানিক দু’জনের লেখাতেই sense of construction-এর অভাব দেখেন। ধূর্জটিপ্রসাদের সাহিত্য-চিন্তায় সমাজবোধ যেমন জরুরি বিবেচিত হয় তেমনি গুরুত্ব পায়; আঙ্গিক সম্বন্ধে সচেতনতা অর্থাৎ ‘standard’। আঙ্গিক অবশ্য রচনা থেকে স্বতন্ত্র কোনও বস্তু নয়, লেখকের ‘ধারণা’য় যদি গলদ থাকে তাহলে আঙ্গিকের দুর্বলতা দেখা যায়।”^{১৮}

এ হেন মন্তব্যে অবশ্য আমরা কোনও সদর্থক সমালোচনা দেখলাম না। এ যেন কেবল লেখার জন্য লেখা; বুদ্ধিদীপ্ত সমালোচকের বুদ্ধিহীন প্রশংসা মাত্র। তবে, জীবনকে সামগ্রিকভাবে দেখা— বিরোধের সমন্বয় ও অভিব্যক্তি— কেমন করে সম্ভব, এই চিন্তা ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাসে বিশেষভাবে দেখা গেছে। সমাজতত্ত্ব ও উপন্যাসে মানুষকেই তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন। অথচ কোন আদর্শের নিষ্কৃতিতে মানিক-সাহিত্যের এই সমাজ-সংস্কৃত মানুষ তাঁর চোখে পড়ল না? এখানে প্রশ্ন জাগে এবং একটা সম্ভাব্য উত্তরের ইঙ্গিতও পাওয়া যায়— কেন কল্লোলের প্রায় আর কাউকে নিয়েই তিনি কলম ধরলেন না। সমকালের লেখকদের সম্পর্কে যথেষ্ট প্রীতি থাকলেও এই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রথম চৌধুরীকে নিয়ে মাত্র একটি করে প্রবন্ধ লিখলেন অথচ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বারোটি প্রবন্ধ!

মানিক সাহিত্য বিষয়ে আমাদের আকাঙ্ক্ষা কেবল শর্তহীন স্তুতি নয়, বরং প্রকৃত গঠনমূলক সমালোচনা। একটি উদাহরণ নিলে প্রস্তাবটি সহজবোধ্য হবে। যেমন, ‘বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’য় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কাহিনির সঙ্গে চরিত্র ও সমাজবাস্তবতার উপস্থাপনার কৌশল নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন; উপন্যাস আলোচনায় শিল্পরূপের মূল্যায়নের প্রচেষ্টাও সেখানে আছে, আর মানিকের লেখনীর অসংলগ্নতার প্রসঙ্গটিও উত্তরাধিকার ধারায় এখানেও এসে পড়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস ‘দিবারাত্রির কাব্য’ বা ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ প্রসঙ্গে সমালোচক যা বলছেন তা ক্রমাশয়ে তুলে ধরা হল—

এক। “দিবারাত্রির কাব্য’ একটি বস্তু-সংকেতের কল্পনামূলক রূপক কাহিনী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ...তথাপি এই সাংকেতিকতার অর্ধভাস্বর আবেষ্টন সত্ত্বেও মানুষগুলিকে রক্ত-মাংসের জীব হিসাবেই আমাদের বিচার করিতে হইবে।”^{২৯}

দুই। “মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘দিবারাত্রির কাব্য’ ও ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ (১৯৩৬) দুইখানি উপন্যাসের মধ্যে অসংলগ্ন অবাস্তবতার সহিত আশ্চর্য পরিণত চিন্তাশীলতা ও বিশ্লেষণনৈপুণ্যের পরিচয় মেলে।”^{৩০}

আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধে ধূর্জটিপ্রসাদ ক্রমাশয়ে হেনরি জেমস, ডি. এইচ. লরেন্স, প্রফুল্ল, ফকনারের রচনারীতির পরিচয় দিয়েছেন। আর সেই সূত্রে মানিকের চরিত্রচিত্রণ ও ‘অপরিচিত শিল্পরূপের’ বিশেষত্বকে বুঝতে চেয়েছেন। তাঁর আলোচনাটি নিম্নরূপ—

“আমি, মোটেই বলছি না যে মাণিকলাল [য] পূর্বে যাঁদের নাম করেছি তাদের মতোন একজন বড় আর্টিস্ট। তাঁর রচনায় অনেক দোষ। হাওয়াতে অনেক পকেট আর গর্ত আছে বলেই প্রভাব-বর্ণনা শিথিল হলে চলে না। লেখকের দুর্বলতা প্রভাবের দুর্বলতা একবস্তু নয়। প্রভাবটা স্ত্রীসুলভ, তাই মাণিকলালের [য] প্রায় প্রত্যেক স্ত্রী-চরিত্রই জীবন্ত, স্ত্রীজাতির মোহটাই প্রহেলিকা, মাণিকলালের [য] স্ত্রী-চরিত্রকে ধরা ছোঁয়া যায় না—কিন্তু সেজন্য সব স্ত্রী চরিত্রই এক ছাঁচের হবে এবং প্রহেলিকার বদলে তারা সকলে একটু এলোমেলো, ছিটখুস্ট হবেন এমন কিছু কথা নেই। যদি তাই হন তবে বুঝব তাদের স্রষ্টার রচনাশক্তিতে না হোক চিন্তাশক্তিতে গলদ আছে।”^{৩১}

পূর্বে উল্লিখিত সমালোচক অভ্র ঘোষের রবীন্দ্র সমালোচনায় ধূর্জটিপ্রসাদের ভূমিকা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি, ধূর্জটিপ্রসাদের বাংলা সাহিত্য সমালোচনা গতানুগতিক পথে অগ্রসর হয় না, বরং মননশীলতা এবং সাহিত্যে নীতির মানদণ্ড তাঁর কাছে প্রধান্য পায়। এখানে আমরা লক্ষ্য করব মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ফ্রেয়েডীয় চেতনার আলোকে যখন নারী চরিত্রের রূপ নির্মাণ করেন, কামনা-বাসনা-যৌনতার জৈবিক প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ তাঁর রচনায় ঘটলে নেতিবাচক সমালোচনায় তাঁকে বিদ্ধ করেছেন ধূর্জটিপ্রসাদ। এখানে তাঁর মননশীলতার রুচিতে আঘাত লাগছে, শিল্পরূপের হানি ঘটছে বলে যা তাঁর কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। সমালোচক ধূর্জটিপ্রসাদের এই ইন্টারপ্রিটেশন সদর্থক, বরং বাস্তবতার সাহিত্যের প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবেই মানিকের রচনারীতি ও অভিরুচির প্রকাশ ঘটেছে বলে তাঁর প্রতি আস্থা রাখি।

8

সমসাময়িক আর একজন মার্কসবাদী সাহিত্যিক গোপাল হালদার, মানিকের সাহিত্য রচনার প্রতিভাকে সদর্থক অর্থেই বিশ্লেষণ করেছেন তিনি। সামাজিক নীতি-নিয়মকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে কাহিনির ডিসকোর্সে তুলে ধরেছেন, দৈহিক ও মানসিক জীবনকে উপস্থাপিত করেছেন, তাতে তাঁর ‘বিদ্রোহী প্রতিভা’র বৈজ্ঞানিক সত্যের শিল্পীত আত্মপ্রকাশ বলেই গোপাল হালদার চিহ্নিত করেছেন। তিনি আরও বলেছেন—

“বহু শিথিল প্রয়োগ সত্ত্বেও ‘জিনিয়াস’ বা ‘প্রতিভা’ কথাটার একটা গভীর তাৎপর্য আছে। নৈসর্গিক সত্যের মতোই ক্রটি তার আবির্ভাব, এবং তর্কাতীত তার প্রকাশ। এ সহজাত কবচকুণ্ডল নিয়ে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরাও অনেকেই জন্মেন না। তবু ‘জিনিয়াস’ বা ‘প্রতিভা’ ছাড়া মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টিশক্তিকে আর কিছু বলার উপায় নেই।”^{৩২}

প্রথম সমালোচক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে মৃত্যুর পরও সমালোচনার আক্রমণ মানিকের পিছু ছাড়েনি, আমৃত্যু নেতিবাচক সমালোচনা ও ষড়যন্ত্রকে তিনি সহ্য করে হয়ে উঠেছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রকৃত নীলকণ্ঠ। এ বিষয়ে সমালোচক মানবিশ চৌধুরী যথার্থ বলেছেন—

“কেউ কেউ মানিকের শেষ জীবনের ডায়েরির পাতা ঘেঁটে বিশ্লেষণ করতে মরিয়া—মানিক ‘কমিউনিস্ট’ এই এক রৈখিক মানুষ ছিলেন না। তিনি মদ্যপ এবং কালীভক্ত ছিলেন—এসব কথা বলে এঁরা মানিকের পূর্বকৃত সমস্ত সাংস্কৃতিক সম্ভারকে নাকচ করে দিতে চান। শেষেরই স্থলনগুলি, এই মনোবিকলনগুলি যে একান্তই শেষেরই স্থলন, এই সত্যটাকে কুয়াশাচ্ছন্ন করে দিতে চান। এবং মানিকের জীবনের রাজনৈতিক মতাদর্শগত, বলা ভালো কমিউনিস্ট মতাদর্শগত কারণে, শ্রেণিগত পক্ষপাতের কারণেই, তাঁর উপর বিপ্রতীপ প্রতিক্রিয়াশীলতার আঘাত, সেই সঙ্গে একজন লেখকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অন্যতম আয়ুধ, প্রকাশকদের তাঁকে বয়কট করার ঘটনা, বিভিন্ন পত্রিকা গোষ্ঠীর মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, তাঁকে ব্রাত্য করার ষড়যন্ত্র এবং এইসব কারণেই মানিকের চরম দারিদ্রের মধ্যে নিপাতিত হওয়া, চিন্মোহন সেহানবীশের ভাষায় ‘রাহুগ্রস্ত’ হওয়ার কারণেই যে তাঁর মনোবিকলন, এই চরম নিদারুণ সত্যটাকে ঘোলাটে করে দেওয়ার অপচেষ্টা করা হয়।”^{২৩}

মানিকের শিল্পরীতি সুপরিচিত বাস্তব-পদ্ধতির গতানুগতিকতা নয়। তাঁর চরিত্রগুলি আসলে কেউ মানুষ নয়, মানুষের projection। গোপাল হালদার যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে বলেন, ‘সাবজেক্ট বা বিষয় থেকেই তিনি বিষয়ীকে চিনতে চান। ভাব থেকে যান রূপে।’ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আসলে জীবনের গূঢ় সৌন্দর্যের কথা লিখেছেন। তাই সমালোচক সরোজমোহন মিত্র তাঁর ‘মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য’ গ্রন্থে সাবলীল ভাবে বলেছেন—

“সহজ সরল বিরাট সুন্দরের সাধনা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্যকৃতির গোরার কথা। এখানেই তিনি অনন্য। বাংলা সাহিত্যে তাঁর পূর্বেও নেই, আজ পর্যন্ত উত্তরেও নেই তাঁর সার্থক সূরী। শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তব প্রকাশ দেখে রাজকীয় কাব্য-ইতিহাসের মানুষ বিমূঢ় হয়েছে। সেজন্য বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে তর্ক-বিতর্কের অন্ত নেই।”^{২৪}

তবে, সমালোচক সরোজমোহন মিত্রের আলোচনার সূত্র ধরে আমরা মানিক সম্পর্কে ধূর্জটিপ্রসাদের ‘বিমূঢ়’ হওয়ার সরল সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি। ‘ধৃতি’ প্রসঙ্গে মানিকের সাহিত্যের দৃঢ়তার যে দোষারোপ করেন প্রাবন্ধিক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, তা আসলে তাঁর বুদ্ধিবাদী মননশীল যে পন্থা, তাঁর নিজ মতের সঙ্গে অমিল থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদের কথাসাহিত্য ভাবনাকেন্দ্রের ক্রিটিক-প্রবণতার দিকটি— যা তাঁর পছন্দের সীমা নির্ধারণ করে আছে, তা তুলে ধরলে পাঠকের কাছে সহজেই বোধগম্য হবে বিষয়টি। এ বিষয়ে সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের বক্তব্য আমাদের কাছে গৃহীত হতে পারে—

“ধূর্জটিপ্রসাদ প্রকৃষ্ট লেখার অত্যন্ত অনুরাগী। পাশ্চাত্য সংগীতেও তাঁর অনুরাগ কম নয়। ডরোথি রিচার্ডসন, জেমস জয়েস, ভার্জিনিয়া উল্ফ প্রমুখ চেতনাপ্রবাহ-পন্থী ঔপন্যাসিকদের সকলের প্রতি তাঁর অনুরাগ গভীর। এই চেতনাপ্রবাহ বা স্বগতকথন রীতি, তিনি নিজে যে রীতিকে গ্রহণ করেছেন, তাকেই তিনি উপন্যাসের যথার্থ আধুনিক টেকনিক বলে মনে করেন।”^{২৫}

আসলে তাঁর একটা বাঁধা পথ ছিল সাহিত্য বিচার ও সমালোচনার, যে পথটি ছিল আধুনিক বুদ্ধিবাদী কিন্তু গোঁড়া ও রক্ষণশীল। বাংলা সাহিত্য নারী চরিত্র আলোচনায় তা সর্বদা উদ্যত ছিল; সমালোচক সুতপা ভট্টাচার্য যেমনটা বিশ্লেষণ করেছেন^{২৬}। মানিকের এই বিশেষ নারীভাবনা সম্পর্কে সমালোচক পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

“প্রচলিত নারীবাদ নয়, পশ্চিম প্ররোচিত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী নারী স্বাধীনতা নয়, যৌনমুক্তির একপেশে জ্ঞান নয়, এখনকার বাস্তবে দাঁড়িয়ে যে বহুমুখী বাস্তববাদে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নারীর গভীর স্বাধীনতার কথা বলেন—এতে জড়িয়ে থাকে শরীর, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি।”^{২৭}

তবে একথা একবাক্যে স্বীকার করতেই হয় যে, শেষ পর্যন্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি সুবিচার করেছে সময় এবং বাংলা সাহিত্যের সারস্বত পাঠকসমাজ।

উপসংহার : আসলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যের পর্বান্তরের দিকে নজর দিলে ধূর্জটিপ্রসাদের সমালোচনার মূল ক্ষেত্র-পরিধিকে আমরা বুঝতে পারব।^{২৮} নেতিবাচক সমালোচনার যে বৃত্তান্ত ধূর্জটিপ্রসাদ থেকে শুরু হয়েছে মানিকের সাহিত্য আলোচনায়, তার কিছু প্রশ্ন নিয়ে একসময় ‘দিবারাত্রির কাব্য’ পত্রিকার ‘মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা’য় আলোচনা করেছিলেন সমালোচক প্রদীপ ভট্টাচার্য। অবশ্য সেখানে কেবল ‘দিবারাত্রির কাব্য’ উপন্যাস বিষয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ ছিল। যেমন সেখানে অন্য অনেকগুলি অভিযোগের সঙ্গে অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোলা একটি অভিযোগ ছিল— মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘উপন্যাসে উৎকেন্দ্রিকতার অভিযোগ’। ধূর্জটিপ্রসাদ-কৃত অভিযোগের একটা উত্তরও সেখান থেকে খুঁজে নিতে পারি, যেখানে প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন—

“হেনরি জেমস, ফ্লবের বা জেমস জয়েসের উপন্যাসে ইতিমধ্যেই এসে পৌছনো শিল্পের বিবর্তনটা সমমাপে আমরা মানিকে পাইনা এ কথা যেমন সত্য, তেমনি আবার যতটুকু পাই তদানীন্তন বাংলা সাহিত্যে অন্তত ব্যতিক্রমী বলেই সেটুকুও আমাদের কাছে অনেক। হয়তো তাঁর এই ব্যতিক্রমটাই কোনো কোনো ঐতিহ্যমণ্ডিত মিস্ত্রি চোখে উৎকেন্দ্রিকতা বলে ভ্রম হয়। ...শিল্পী মানিককে উৎকেন্দ্রিক নয়, বরং চিরাচরিত ঐতিহ্যবাহী বলেই মনে হয়।”^{২৯}

তবে, মানিকের সাহিত্যরচনার পর্বান্তরের মধ্যে যেভাবে তাঁর কথনবিশ্বের পরিবর্তন ঘটেছে, সেদিকে নজর দিলে সমস্যাটির একটা চরিত্রগত বিশিষ্টতা আমাদের কাছে বোধগম্য হবে। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে সরাসরি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনশৈলীরও পরিবর্তন ঘটেছিল। এতদিন তাঁর ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব ছিল মূল উপজীব্য, আর ১৯৪৪ থেকে রাজনৈতিক মতাদর্শগত সিদ্ধান্ত অর্থাৎ শ্রেণিচেতনা তাঁর রচনার একতম আধার হয়ে ওঠে। এ সম্পর্কে প্রখ্যাত অধ্যাপক ও সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তী বলেছেন—

“মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য সৃষ্টির প্রধান প্রবণতা ছিল মনস্তত্ত্বের বিকার। কিন্তু ১৯৪৩-৪৪ সাল থেকে তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসগত সিদ্ধান্ত একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শ অবলম্বন করেছিল তা আমরা জানি। সেই সময় থেকে পরবর্তী পর্বের লেখায় এসেছিল কিছুটা অন্যরকম জীবনভাবনা। এই পর্বের ছোটগল্পে আমরা মধ্যবিত্ত আর নিম্নবিত্ত-উভয় শ্রেণির মানুষকেই কিছুটা ভিন্নভাবে পেয়েছি।”^{৩০}

এ তো গেল মানিকের প্রথম পর্বের সঙ্গে দ্বিতীয় পর্বের রচনার মৌল পট পরিবর্তনের প্রসঙ্গ, যেখানে আমরা দেখব, প্রাবন্ধিক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রথম পর্বের মধ্যেই মানিকের সাহিত্য সমালোচনায় দাড়ি টেনেছেন—যা ছিল প্রধানত অধ্যাপক চক্রবর্তীর মতানুযায়ী ‘মনস্তত্ত্বের বিকার’ পর্ব। ফ্রয়েড থেকে মার্কসের দিকে যে যাত্রা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-ভাবনার মধ্যে নিহিত তা আলোচনা ব্যতিরেকে মানিকের রচনার মূল্যায়ন অসমাপ্তই থেকে যায়—যা ঘটেছে ধূর্জটিপ্রসাদের ক্ষেত্রে। কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকবৃন্দের সঙ্গে স্বভাবগত কারণেই ধূর্জটিপ্রসাদের দূরত্বের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। আর মানিকের এই প্রথম পর্বের, বিশেষত ফ্রয়েডীয় প্রভাবের কথাসাহিত্য সংগত কারণেই ধূর্জটিপ্রসাদের অপছন্দের তালিকায় ছিল। তা সত্ত্বেও মানিকের শৈলী, শক্তি ও জনপ্রিয়তাকে^{৩১} তিনি অস্বীকার করতেও পারেননি। বাস্তববাদী আধুনিকতা অর্থাৎ কল্লোলীয় লক্ষণের প্রসঙ্গে মানিকের সমালোচনায় সত্যেন্দ্রনাথ রায় বলেছেন—

“মানিকের আধুনিকতার লক্ষণীয় একটা দিক হল যৌনতার স্বীকৃতি—সেক্স যে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা-ভাবনা, চেষ্টা-চরিত্রের ক্ষেত্রে একটা বড়ো শক্তি, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা—অবদমিত যৌনতা মানুষের মনোবিকলনের প্রধান—প্রধান কেন, একমাত্র হেতু উপন্যাসে এই তত্ত্বের স্বীকৃতি। কল্লোলের সঙ্গে মানিকের অন্য কোনো যোগ না থাকলেও এই স্বীকৃতির মধ্যেই একটা ভাবগত যোগ খুঁজে পাওয়া যায়। কল্লোলীয়রা যা চেয়েছিলেন কিন্তু পারেননি, মানিক তা পেয়েছেন।”^{৩২}

আবার আমরা দেখেছি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরি ও চিঠিপত্র ১৩৮১-৮২ তে পরপর তিন সংখ্যায় ‘এক্ষণ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তখন সমালোচক মহলে মিশ্র-প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল। তাঁর মদ্যাসক্তি, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত নানান

তথ্য আমাদের সামনে আসতে থাকে। মানিকের বিরুদ্ধে যারা ‘প্রতিভার উচ্ছৃঙ্খলতা’ ও ‘শিল্পীর খামখেয়ালিপনা’—এই ভাবধারা দিয়ে মানিককে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ‘হরফ’ উপন্যাসেই উত্তর দিয়েছেন স্বয়ং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।^{১০} সমালোচক মালিনী ভট্টাচার্য ‘মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: অপ্রকাশিত’ নামক রচনায় কিভাবে মানিকের সাহিত্য ১৯৪৪ থেকে মূলত বাঁক নিয়েছে এবং তাঁর ফলশ্রুতি সমালোচনার জগতে কিভাবে প্রভাব ফেলেছে তা দেখিয়েছেন। তাঁর লেখা থেকে উদ্ধৃতি নেওয়ার লোভ এখানে সামলানো গেল না, কারণ তাঁর সঙ্গে আমাদের সহমত হতেই হয়—

“আসলে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছুটা স্বয়ংবৃত্ত দারিদ্র, তাঁর মদ্যাসক্তি, তাঁর মানসিক বিকার—প্রতিক্রিয়াশীল সমালোচক এই সবই মেনে নিতে পারতেন, খামখেয়ালিপনার কারণ দেখিয়ে। মুশকিল ঘটালেন মানিক স্বয়ং ১৯৪৪ সালে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে এবং আমৃত্যু ঐ পার্টির উৎসাহী সক্রিয় কর্মী থেকে। এটাকেও খামখেয়াল বলা যেত, কিন্তু এক কিংবদন্তি তৈরি হলো যে এই বারো বছরে ক্রমেই মানিকের সৃজনীপ্রতিভার অপকর্ষ ঘটেছিল।”^{১১}

কল্লোলের বাস্তববাদী সাহিত্য আন্দোলনের প্রতি ধূর্জটিপ্রসাদের মতানৈক্য ছিল সে কথা আগেই বলেছি।^{১২} তাই খেটে খাওয়া দরিদ্র শ্রমিক-মজুর ও নিম্নবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মানুষদের ক্ষুধা, যৌনতার বাস্তবচিত্র যখন মানিক তাঁর লেখনীর বিষয় করে তুলেছেন, তখন তা ধূর্জটিপ্রসাদের মতো এলিট বুদ্ধিবাদী সমাজতত্ত্ব গবেষকের অপছন্দের বিষয় হয়ে উঠেছে। অথচ আমরা দেখছি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার বিষয় ও বিষয়ীর ক্ষেত্রে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়-কথিত attitude towards life হয়ে উঠেছে দুর্বলতার অভিযোগগুলিই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাসের রচনার শিল্পরীতির আলোচনাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে, শ্রেফ তা প্রগতি সাহিত্যের পরিপন্থী— এই যুক্তিতে। ‘তাঁর রচনায় ধৃতি নেই’ এবং ‘শক্ত মুঠির শিক্ষা তাঁর নেই’—এই সিদ্ধান্ত যে ত্রুটিপূর্ণ এবং একপেশে তা আমাদের আলোচনায় প্রতিভাত হল; এবং এই সিদ্ধান্তে আমরা পৌছাতে পারি যে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যের সারশূন্যতা আসলে তাঁর সাহিত্যিক ও সমাজতাত্ত্বিক উন্নাসিকতারই পরিচয়বাহী। প্রগতি সাহিত্যের যে ধূয়া তোলা হয়েছিল সমকালে; আঙ্গিকের বিচার নয়, বুর্জোয়া শ্রেণির বিরুদ্ধে সাহিত্যের উচ্চস্বর প্রকাশই সাহিত্য— এ ভাবনা যে অন্যদিকে কতটা বিধ্বংসী তা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাতেই স্পষ্ট হয়েছে, যা ঐ ‘পরিচয়’ পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল—

“আঙ্গিক সহজ হবে, আঙ্গিকের বিশেষ মূল্য নেই এই ধারণাও প্রগতি সাহিত্যকে ব্যহত করেছে।...সোজা সহজভাবে বিপ্লবী ভাবচিন্তাকে প্রকাশ করার আঙ্গিকই প্রগতি সাহিত্যের আঙ্গিক হবে, একথা বলাও বুর্জোয়া-প্রতিক্রিয়া, ছদ্মবেশী সংস্কারবাদ। এই ধারণা ধারণা সৃষ্টি হয়েছে দু’ভাবে, বুর্জোয়া-আঙ্গিক-সর্বস্বতার প্রতিক্রিয়ায় আঙ্গিকেই বাতিল করতে চাওয়ার ঝোঁক এবং অজ্ঞ অশিক্ষিত মজুর কিষানের সহজিয়া সাহিত্যই কেবল গ্রহণীয় এই লেলিনবাদ-বিরোধী যান্ত্রিকতা থেকে।”^{১৩}

দলিত, নিপীড়িত মানুষের কথা অনবদ্য ও নিরাসক্তভাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কথাসাহিত্যে বলেছেন। আর এই ভঙ্গিতেই তিনি পরবর্তীকালের লেখক ও পাঠককে প্রাণিত ও প্রভাবিত করতে পেরেছেন।^{১৪}

Reference:

১. মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ, ‘মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়’, পুন:মুদ্রণ, ফ্রোডপত্র, ‘শতবর্ষে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়’, অনুষ্ঠাপ, কলকাতা, শীত-গ্রীষ্ম সংখ্যা, বর্ষ-৪২, ২য়-৩য় সংখ্যা, ২০০৮, পৃ. ২৩৬
 ২. রায়, অলোক, ‘সাহিত্যিক ধূর্জটিপ্রসাদ’, ‘বিশ শতক’, প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ২২১
- এখানে সমালোচক বলেছেন— “ধূর্জটিপ্রসাদ ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষাতেই লিখেছেন। ইংরেজি লেখা যারা পড়েছেন তাঁরা ধূর্জটিপ্রসাদকে অর্থনীতিবিদ ও সমাজতাত্ত্বিক বলে জানেন। বাঙালি পাঠকেরা তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পের সন্ধান রাখেন, সাহিত্য ও সংগীত সমালোচক হিসেবে তাঁর তাঁর প্রশংসা বা নিন্দা করে থাকেন।”

৩. মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', পুন:মুদ্রণ, ক্রোড়পত্র, 'শতবর্ষে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়'। অনুষ্ঠাপ, কলকাতা, শীত-গ্রীষ্ম সংখ্যা, বর্ষ-৪২, ২য়-৩য় সংখ্যা, ২০০৮, পৃ. ২৩৬
৪. দাশ, ধনঞ্জয় (সম্পাদিত), 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক' দ্বিতীয় খণ্ড, নতুন পরিবেশ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬০, পৃ. ১৫
৫. Jacques Derrida. 'Writing and Deference'. The University of Chicago Press, London, 1987, p. 280
- দ্রষ্টব্য: জাক দেরিদার ভাষায়, 'when language invaded the universal problematic... everything becomes discourse.'
৬. বসু, প্রদীপ, 'রাজনীতির তত্ত্ব তত্ত্বের রাজনীতি', চর্চাপদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১১, পৃ. ১৪৮
৭. ভট্টাচার্য, সুতপা, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে নর-নারীর সম্পর্ক: প্রথম পর্যায়', 'বিশ শতকের কথাসাহিত্য অপণ্ডিতের পাঠ', রত্নাবলি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৯, পৃ. ৩৮
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', দে'জ, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ নভেম্বর ২০০৩, পৃ-২৭২
৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, 'সাহিত্য করার আগে', 'লেখকের কথা', নিউ এজ পাবলিশিং প্রাঃ. লিঃ, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৭, পৃ. ২২
১০. ভট্টাচার্য, বিশ্ববন্ধু, 'কথাসিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৪, পৃ. ৪০
১১. মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', পুন:মুদ্রণ, ক্রোড়পত্র, 'শতবর্ষে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', অনুষ্ঠাপ, কলকাতা, শীত-গ্রীষ্ম সংখ্যা, বর্ষ-৪২, ২য়-৩য় সংখ্যা, ২০০৮, পৃ. ২৩৬
১২. মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ, 'ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১০, কলকাতা, পৃ. ৫২৮
১৩. বসু, নিতাই, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজজিজ্ঞাসা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬, পৃ. ৪০
১৪. মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ, 'ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১০, কলকাতা, পৃ. ৩০
১৫. তদেব, পৃ. ১২৮
১৬. তদেব, পৃ. ৮০৫
১৭. তদেব, পৃ. ১২৯
১৮. রায়, অলোক, 'সাহিত্যিক ধূর্জটিপ্রসাদ', 'বিশ শতক, প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ২২৩
১৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, পুনর্মুদ্রণ ২০১৬, পৃ. ২৭৯
২০. তদেব, পৃ. ২৭৯
২১. মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ, 'ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১০, কলকাতা, পৃ. ৫২৬
২২. হালদার, গোপাল, 'মানিক প্রতিভা', 'দিবারাত্রির কাব্য' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা, আফিফ ফুয়াদ সম্পাদিত, সপ্তদশ বর্ষ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, প্রকাশ-১৯৯৮, কলকাতা, পৃ. ১২৭
২৩. চৌধুরী, মানবিশ, 'আমার মানিক—আমাদের মানিক', তদেব, পৃ. ২২১

২৪. মিত্র, শ্রীসরোজমোহন, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য', গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ ১৯৭০, পৃ. ১
২৫. রায়, সত্যেন্দ্রনাথ, 'বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ২২০
২৬. ভট্টাচার্য, সুতপা, 'ধূর্জটিপ্রসাদ কি নারীবিরোধী ছিলেন?', 'মেয়েলি পাঠ', পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ১০৬
- লেখক এখানে আলোচনার সমাপ্তিতে বলেছেন— "ধূর্জটিপ্রসাদকে পুরোপুরি নারীবিরোধী বিশ্লেষণ দেওয়া ঠিক নয়, শুধুমাত্র শিক্ষিতা মেয়েদের প্রতিই ছিল তাঁর বিরাগ, বলা যায়, তারা তাঁর প্রত্যাশা পূরণ করেনি।"
২৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম, 'নারী স্বাধীনতা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', 'দিবারাত্রির কাব্য' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা। আফিফ ফুয়াদ (সম্পাদিত), কলকাতা, সপ্তদশ বর্ষ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, প্রকাশ-১৯৯৮, পৃ. ২৯৫
২৮. দাশ, শচীন, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প: দুই পর্বের বাস্তবতা', 'ফিরে দেখা : ছোটগল্প', জ্যোতির্ময় দাশ ও অসীমকুমার বসু (সম্পাদিত), পত্রলেখা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৯, পৃ. ১৬৮
২৯. ভট্টাচার্য, প্রদীপ, 'উপন্যাস দিবারাত্রির কাব্য প্রসঙ্গে', 'দিবারাত্রির কাব্য' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা, আফিফ ফুয়াদ সম্পাদিত, কলকাতা, সপ্তদশ বর্ষ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, প্রকাশ-১৯৯৮, পৃ. ১৬৭
- দ্রষ্টব্য: এখানে সমালোচক আরও বলেন— "...মানিক-শিল্পের বিরুদ্ধে ওঠা বেশ কতগুলো প্রশ্নবিহীন বিশ্লেষণ করে আমরা দেখলাম যে প্রশ্নগুলো শিল্পের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অবশ্যই ওঠে কিন্তু আবার শিল্পী হিসেবে মানিকের বৈশিষ্ট্যের নিরিখে সেগুলোর অধিকাংশ সূক্ষ্ম বিচারে খারিজও হয়ে যায়। আসলে একজন শিল্পীকে তাঁর নিজস্বতা বজায় রাখার স্বাধীনতাটুকু আমাদের দিতেই হয়। এ নাহলে তাঁর অনন্যতার সামনে গিয়ে আমরা দাঁড়াব কী করে?"
৩০. চক্রবর্তী, সুমিতা, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প: মধ্যবিত্তের আত্মদর্পন', 'ছোটগল্পের বিষয়-আশয়', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১২, পৃ. ১৯৩
৩১. মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ, 'মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়', 'অনুষ্টিপ', অনিল আচার্য সম্পাদিত, কলকাতা, বর্ষ ৪২, ২য়-৩য় সংখ্যা, ২০০৮, পৃ. ২৩৪
- আলোচ্য 'মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়' নামক প্রবন্ধেই ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেছেন— "বাংলা দেশে তাঁর বই কী রকম বিক্রি হয় জানি না, কিন্তু এমন একাধিক অ-বাঙালী দেখেছি যারা তাঁর রচনা সম্বন্ধে নিতান্ত আগ্রহশীল।"
৩২. রায়, সত্যেন্দ্রনাথ, 'বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০০, পৃ. ২০৩
৩৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, 'মানিক গ্রন্থাবলী', ত্রয়োদশ খণ্ড, গ্রন্থালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৬, পৃ. ১৪৩
৩৪. ভট্টাচার্য, মালিনী, 'নির্মানের সামাজিকতা ও আধুনিক বাংলা উপন্যাস', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৮, পৃ. ১৫
৩৫. মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ, 'বর্তমান গদ্য সাহিত্যে তিনখানি ভালো বই', 'ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১০, কলকাতা, পৃ. ৪৫৬
- কল্লোল গোস্বামী লেখকদের সম্পর্কে এখানে প্রসঙ্গক্রমে প্রাথমিক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেছেন— "কল্লোলের সাহিত্যিকবৃন্দ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে গ্রাহ্য করেন না—কেন না তাঁদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে প্রবৃত্তিমূলক, এবং প্রবৃত্তির ধর্ম বড়ই একঘেয়ে।...দরিদ্র নারায়ণের ক্রন্দনে হৃদয় যত পারে আন্দোলিত হোক, কিন্তু শিল্পক্ষেত্রে সে আন্দোলন আমাদের দেশে অন্য আন্দোলনের ন্যায় বাস্তবের দোহাই দিয়ে অ-বাস্তবের অত্যাচার হলেই দুঃখ।"
৩৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা', 'পরিচয়', গোলাম কুদ্দুস ও সরোজ কুমার দত্ত সম্পাদিত, কলকাতা নবম পর্যায়— প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৫০, পৃ. ৬২

https://sanhati.com/wp-content/uploads/2008/06/opt_1_new_porichoy_january_1950.pdf

৩৭. মিত্র, অমর, ‘আমার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়’, ‘অনুষ্ঠাপ’, অনিল আচার্য সম্পাদিত, কলকাতা বর্ষ ৪২, ২য়-৩য় সংখ্যা, ২০০৮, পৃ. ৩১৬

লেখক এ প্রসঙ্গে বলেছেন— “মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতীত আর কোনো বাঙালি লেখক তাঁর পরবর্তী কালের গদ্য লেখকদের উপর এত দীর্ঘছায়া ফেলতে পারেন নি। আমি যখন লিখতে আরম্ভ করি, গত শতাব্দীর সেই সাতের দশকের আরম্ভে, তখন মানিক ব্যতীত আর কেউ জরুরি লেখক হয়ে আমার কাছে আসেন নি।”